

সেকুলারিজম প্রশ্ন

ফাহমিদ-উর-রহমান



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

সেকুলারিজম প্রশ্ন	১১
মুসলিম সাহিত্যসমাজ : পূর্ববঙ্গে ইসলামবিদ্বেষের সাংস্কৃতিক পটভূমি	৩১
আবদুর রাজ্জাক থেকে আহমদ ছফা : সেকুলারিজমের পালাবদল	৬১
হুমায়ুন কবির : আমাদের সেকুলার হয়ে ওঠার বিপদ	৭৯
সৈয়দ মুজতবা আলী : জাতীয়তাবাদের দোলাচল	৮৮

সেকুলারিজম প্রশ্ন

০১

নূবিজ্ঞানী তালাল আসাদ হলেন জগদ্বিখ্যাত ইসলামবিদ মোহাম্মদ আসাদের পুত্র। পিতার মতো পুত্র সব সময় একই রকম হবেন, এমন কোনো কথা নেই। তালালও সে পথে হাঁটেননি। তবে বিদ্বান পিতার বিদ্বান পুত্র এই সিলসিলা তিনি জারি রেখেছেন।

বিশ শতকের মাঝামাঝি মোহাম্মদ আসাদ তাঁর সৃষ্টিশীল লেখালেখির ভেতর দিয়ে ইসলামের জন্য এক স্বপ্ন তৈরি করেছিলেন। এই স্বপ্ন অধরা হলেও বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান আজও এই স্বপ্নের ভেতর দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎকে অবলোকন করতে চায়। তালাল পিতার এই স্বপ্নের শরিক হননি। তিনি যখন গত শতকের পঞ্চাশের দশকে বিলাতে পড়াশোনা করতে যান তখন তিনি মার্কসবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন এবং তার লেখালেখিতে অনেক ক্ষেত্রে এই মার্কসবাদের যুক্তিগুলোর সযত্ন ব্যবহার আমরা দেখি। কমিউনিজমের পতনের পর এই নূবিজ্ঞানী পণ্ডিতের পশ্চিমের অনেক মার্কসবাদী ভাবুকের মতোই ভাবান্তর হয়। যাদেরকে উত্তর-আধুনিকতাবাদের পথিকৃৎ মনে করা হয়। এরা পশ্চিমের জ্ঞানকাঠামোকে সমালোচনা শুরু করেন। তালালের ভেতরেও এটা আমরা দেখি। তিনি নতুন অবস্থানে এসে পশ্চিমা আধুনিকতার অন্যতম খুঁটি সেকুলারিজমকে নিয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং এর সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করতে আরম্ভ করেন। এক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিক ভাবুক মিশেল ফুকোর প্রভাব তার ওপর লক্ষ করা যায়।

তালাল সেকুলারিজমের ওপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন, যা অ্যাকাডেমিয়ার জগতে বেশ প্রভাবশালী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বইগুলো হচ্ছে : *জিনিয়লজিস অব রিলিজিয়ন, ফরমেশনস অব সেকুলার ও সেকুলার ট্রানসেলেশনস*। এসব বইয়ে সেকুলারিজম সম্পর্কে তিনি আমাদের নতুন ধারণা দিয়েছেন এবং গতানুগতিক আলোচনার বাইরে সেকুলারিজমের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তার এসব আলোচনা ঠিক প্রথাগত ধর্মীয় পটভূমি থেকে আসেনি। সেকুলার জ্ঞানকাণ্ডের ভেতরে থেকেই ইউরোপে উদ্ভূত এই চিন্তা ও দর্শনের সাথে তিনি বোঝাপড়া করেছেন। একে বলা যায়—*Secular critique of the secular*.

তালালের এ আলোচনা ও পর্যবেক্ষণগুলোকে আমরা এভাবে সারসংক্ষেপ করতে পারি :

১. ধর্মের সাথে লড়াই করে সেকুলারিজমের পয়দা হলেও তালালের কথা হলো, সেকুলারিজমেরও ধর্মের মতো চরিত্র-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ধর্মের যেমন উৎসব আছে, আইকন আছে, তীর্থস্থান আছে, প্রথা ও রীতি আছে সেকুলারিজমেরও একই রকম প্রথা-পদ্ধতি বর্তমান। ধর্মীয় পুরুষদের মতো সেকুলার নেতাদেরও একই রকম দেবত্ব আরোপ করা হয়। ধর্মের রীতিকে চ্যালেঞ্জ করলে ব্লাসফেমির মতো ঘটনা ঘটে। তেমনই সেকুলার রীতিকে চ্যালেঞ্জ করলে রাষ্ট্র এসে তাৎক্ষণিক টুটি চেপে ধরে। তালাল লিখেছেন—

‘However, I am not persuaded that because national political life depends on ceremonial and on symbols of the sacred, it should be represented as a kind of religion—that it is enough to point to certain parallels with what we intuitively recognize as religion.’^১

২. ইউরোপে যখন সেকুলারিজমের পয়দা হয়, তখন বলা হয়েছিল রাষ্ট্র বা গণজীবন থেকে ধর্মকে দূরে হটিয়ে দিতে পারলে নাগরিকদের ভেতরে বৈষম্য থাকবে না এবং ধর্মীয় হানাহানির পথ বিলুপ্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল? ইউরোপ-আমেরিকার ইতিহাস থেকে দেখছি, ধর্মীয় সন্ত্রাস রাতারাতি জাতীয় রাষ্ট্র ও উপনিবেশিক সন্ত্রাসে পরিণত হলো। সেকুলারিজম তার রিজন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে দেশে ঢের সন্ত্রাস করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে ফ্রিডম ও লিবার্টির সমর্থক মনে করে। এই ফ্রিডম বা লিবার্টি যুক্তরাষ্ট্রের নিজের মতো করে বানানো লিবার্টি, সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য লিবার্টি নয়। এই লিবার্টির কেউ প্রতিবাদ করলে সে লিবার্টির শত্রু হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং আইনি বা বেআইনি সন্ত্রাসের শিকার হয়। তালাল তাই যথার্থ লিখেছেন—

‘A secular state does not guarantee toleration; it puts into play different structures of ambition and fear. The law never seeks to eliminate violence since its object is always to regulate violence.’^২

৩. সেকুলারিজমের সাথে প্রায়শই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যুক্ত করে দেখা হয়। কিন্তু কার্যত বহুক্ষেত্রে সেকুলারায়ন প্রক্রিয়ার সাথে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যুক্ত থাকে এবং সেকুলারিজমকে কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো বিরোধী মত দমনের জন্য ব্যবহার করে থাকে। তালালের কথায়—

‘Of course, secularization has been undertaken not only by liberal democratic states but by authoritarian states, too, and this only shows how ambiguous liberal language is, how committed both

types of secular state are, above all, to the definition and maintenance of modern power.’^৩

৪. সেকুলারিস্টদের কথা হলো, রাষ্ট্রে সব নাগরিকের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হলে ব্যক্তি ও গণজীবনের পৃথক সীমানা থাকা চাই। কিন্তু আদতে সেকুলার রাষ্ট্র তার আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যক্তি পরিসরেও হানা দিয়ে থাকে। তালালের তাই সংগত প্রশ্ন—

‘Secularists accept that in modern society the political increasingly penetrates the personal. At any rate, they accept that politics through the law, has profound consequences for life in the private sphere. So why the fear of religious intrusion into private life?’^৪

৫. সেকুলারিজম ধর্মের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের তুমুল বিরোধী। এ কারণে এটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও চিন্তাকে দমন করার চেষ্টা করে, যাতে তাদের ভাষায় অসহিষ্ণুতা মাথা চাড়া না দেয়। এক্ষেত্রে সেকুলারিজম কেন্দ্রীভূত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার দিকেই পা বাড়ায়। পাশাপাশি তাত্ত্বিকভাবে এটিতে তার অবিশ্বাসের কথাই ঘোষণা করে।

আমাদের এখানে সেকুলারিজমের বয়ান যারা নির্মাণ করেছেন, তাদের বড়ো একটা অংশ প্রগতিশীল বলে পরিচিত এবং হয় কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন। এ দেশে আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা কিংবা কমিউনিজমের চর্চা— যাই বলি না কেন, কোনো সেকুলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হয়নি এটা ঐতিহাসিক সত্য। কলোনির যুগে কলকাতার এলিট হিন্দুদের ঔরসে এবং ব্রিটিশদের ব্যবস্থাপনায় যে বেঙ্গল রেনেসাঁর পত্তন হয়েছিল, সেটাকে অনেকে এ দেশে আধুনিকতা বলে স্তব করলেও এটা কোনো সেকুলার ঘটনা ছিল না।

বেঙ্গল রেনেসাঁর ভেতর দিয়ে যে রাজনীতি ও সংস্কৃতি তৈরি হলো, তার কোনো জাতীয় পরিচয় তৈরি হয়নি। হিন্দুদের হেজিমনি আকারে সেদিন যে রাজনীতি বা সংস্কৃতি খাড়া হলো, সেখানে বাংলাভাষীদের বড়ো শরিক বাঙালি মুসলমানের যেমন জায়গা হলো না, তেমনি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিও পরিত্যাজ্য হয়ে রইল। সেই কালে বাঙালি মানে দাঁড়াল হিন্দু জাতির সমার্থক। তার মানে যাহা হিন্দু তাহাই বাঙালি। এ কথা সহজ মানে দাঁড়াল মুসলমানরা কেউ বাঙালি নন। বেঙ্গল রেনেসাঁ নামের এই হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প সেদিন বাঙালির সংজ্ঞা তৈরি করল। এই এথনিক বাঙালিত্ব যারা মেনে নিতে চাইল না বা এই বাঙালিত্বকে যারা চ্যালেঞ্জ করল, তাদেরকে বলা হলো সাম্প্রদায়িক। আর যারা এই হিন্দুত্ববাদী বাঙালি প্রকল্পের অংশীদার হলো, তাদেরকে বলা হলো অসাম্প্রদায়িক, উদার ও প্রগতিশীল। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, বাঙালি মুসলমানের শিরে সেই থেকে এই সাম্প্রদায়িকতার তকমাটা আজও জুড়ে আছে।

বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প প্রথমবারের মতো ধাক্কা খায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়। বঙ্গভঙ্গ কায়েমের পর কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু এলিটরা ভয় পেয়ে যায় এই ভেবে যে, পূর্ববঙ্গে তাদের জমিদারি আধিপত্য তছনছ হয়ে যেতে পারে এবং ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলমানদের কলকাতার সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখে। এটাই কলকাতা সহ্য করতে পারেনি। সেখানকার হিন্দু এলিটরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ফ্যান্টাসি শুরু করে। এই সশস্ত্র লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেয় ‘অনুশীলন’ ও ‘যুগান্তরে’র মতো দুটো গ্রুপ।

অনুশীলন ও যুগান্তর ছিল হিন্দু এলিট ও জমিদারদের স্বার্থের লোক। এখন বলা হচ্ছে, এরা নাকি স্বাধীনতার লড়াই করেছিল। অথচ এর আগে বাঙালি হিন্দুরা কোনোদিন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একটা টিলও ছোড়েনি। নিজেদের জমিদারি আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই তারা এই সশস্ত্র উদ্যোগ নিয়েছিল। বিস্তৃত সশস্ত্র উদ্যোগ নিলেই সেটা যে বিপ্লবী হয়ে যাবে অথবা জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন হবে, এমন কোনো কথা নেই। অত্যাচারী জমিদারদের স্বার্থের আন্দোলন

কীভাবে স্বদেশি আন্দোলন কিংবা সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলন হয়? এটা ছিল নিছক কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু এলিটদের স্বার্থের পক্ষের হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

বাঙালি হিন্দুরা উপায়ান্তর না দেখে সে সময় বাঙালিদের নামে বাঙালি মুসলমানদের কাছে ডাকার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তারা ‘রাখীবন্ধন’ আর ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গান গেয়ে গেয়ে জাতীয় ঐক্যের ধূয়া তোলেন। কিন্তু বেঙ্গল রেনেসাঁর প্রকল্প তো ইতঃপূর্বে বাঙালির জাতীয় ঐক্যের পিঠে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছিল। তাই মুসলমানরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের গানের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি।

বহুদিন পর রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকারীদের সাথে সংশ্রব ত্যাগ করে এই আন্দোলনের পরিণাম পর্যালোচনা করতে বসেন, তখন তার মনে এই প্রশ্নটা উদিত হয়—কেন এত বড়ো আন্দোলন মুসলমান সমাজকে নাড়া দিতে পারল না? তিনি যখন কালান্তরের বিখ্যাত লেখাগুলো লিখেছেন, তখন হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটা গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দুর জাতপাতের রাজনীতি মুসলমান সমাজকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, এটা তিনি হয়তো কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো, জমিদারদের বানানো অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টি পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে বিলীন হয়ে যায়। তার মানে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সাচ্চা সাম্প্রদায়িক কর্মীদের হাতে এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন হয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে এরা যোগদান করলেন বটে, কিন্তু এদের মনের সাম্প্রদায়িক কাঠামোটা তারা কখনো ত্যাগ করতে পারেনি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এভাবে এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করল। কমিউনিস্ট পার্টি তাই কখনো সেকুলার ও অসাম্প্রদায়িক হতে পারেনি; বরং সেকুলারিজমকে এরা হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের অংশ বানিয়ে ছাড়ল। এরা যত বেশি অসাম্প্রদায়িকতা-প্রগতিশীলতার কথা বলে, বুঝতে হবে এটার তলায় হিন্দুত্ববাদের জামা লুকিয়ে আছে। আর এর শর্ত তৈরি হয়েছিল জমিদারদের হাতে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ : পূর্ববঙ্গে ইসলামবিদ্যেশ্বের সাংস্কৃতিক পটভূমি

০১

মুসলিম সাহিত্য সমাজ নিয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে এর পটভূমিটা একটু আলোচনা করা দরকার। তাহলে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তৎপরতা বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা শহরে, ১৯২৬ সালে। এর মুখপত্রের নাম ছিল ‘শিখা’। এ কারণে এদেরকে শিখাগোষ্ঠীও বলা হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কর্ণধার ছিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলার শিক্ষক কাজী আবদুল ওদুদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সের শিক্ষক আবুল হুসেন। এদের কর্মতৎপরতার মূলকেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল। প্রধানত তরুণ মুসলিম ছাত্রদের অভিমুখ করেই এ প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র পাঁচ বছর আগে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত পিছিয়ে পড়া পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার ব্রাহ্মণরা এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এদের বিরোধিতার মুখে মুসলিম নেতারা অনেক লড়াই করে এ বিশ্ববিদ্যালয় শেষমেশ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর মতো নেতারা চেয়েছিলেন এটি মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হবে এবং বাঙালি মুসলমান তরুণরা আধুনিক শিক্ষা পেয়ে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্গামিতা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারবে। তারা প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে আলীগড়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড় হতে পারেনি। এর কারণ আমরা এখন একটু খতিয়ে দেখব।

প্রথমদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্ররা ছিল সংখ্যালঘু। অন্তত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অবধি। এর একটা প্রধান কারণ ছিল মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা নেবার মতো যথেষ্ট অর্থনৈতিক সংগতি ছিল না। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টিতে যোগ দেওয়ার মতো বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান শিক্ষক পাওয়া যায়নি। এই শূন্যতার সুযোগ নেয় বাঙালি হিন্দুরা এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল, তারা এসেই এটির ফ্যাকাল্টি ভরে ফেলে।

এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বোধন কালেই এখানে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর শিক্ষানৈতিক ও অবকাঠামোগত টুলসগুলো হিন্দুদের হাত দিয়েই তৈরি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বেনিফিশিয়ারি হয় হিন্দুরাই। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে না পারলেও হিন্দুরা এটিকে সাংস্কৃতিকভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডামি বানিয়ে ফেলে। ফলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে যে মুসলমান ছেলেরা বেরিয়ে আসে তারা মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো আবহাওয়া পায়নি। এর ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী ও বিপজ্জনক!

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে শিখাগোষ্ঠীর মতো একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উত্থান খুবই প্রশ্নবোধক। সেই কালে মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তার অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করাটা বড়ো একটা বিষয় ছিল। মুসলিম নেতারাও সেইভাবে চিন্তা করেছিলেন। এইসব জরুরি প্রশ্ন এড়িয়ে শিখাগোষ্ঠীর নেতারা বললেন— মুসলমান সমাজ অনগ্রসর, পশ্চাদ্গামী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মে মোহাবিষ্ট। এর কারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে নিহিত। তাই ইসলাম ধর্মের একধরনের সংস্কারের পক্ষে তারা মতামত হাজির করলেন। এমনকি তারা শরিয়তের কিছু অংশ বর্জনের পক্ষেও মত দেন। তাদের মতে, এটা করলেই মুসলিম সমাজ শনৈ শনৈ প্রগতির পথে অগ্রসর হবে। শিখাগোষ্ঠীর এই রহস্যজনক তৎপরতা নিয়ে বাংলাদেশের একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী লিখেছেন—

‘ব্রিটিশ ভারতের দু শ বছর ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বাঙালি মুসলমানদের ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-ইতিহাস-ঐতিহ্যের ওপর যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে গিয়েছিল, সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আপন ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজই ছিল তৎকালীন বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কাজ। সে কাজটি কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিতুমীর, হাজী শরীফুল্লাহ ও সৈয়দ আমীর আলীর মতো বাঙালি মুসলিম মনীষীরা অনেক আগে থেকেই শুরু করেছিলেন। কিন্তু শিখাগোষ্ঠী সেই পথে পা না বাড়িয়ে বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনে নামলেন কলকাতার অনুকরণে মুসলিম সমাজকে ‘আধুনিক’, ‘প্রগতিশীল’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বানানোর উদ্দেশ্যে।

শিখাগোষ্ঠীর পয়লা মেন্টর ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি বরাবরই অখণ্ড ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাস করতেন। ভারত বিভাগকে সমর্থন করেননি। এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাও তার কাছে অনভিপ্রেত ছিল। রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং গান্ধী আদর্শের তিনটি মূলনীতির প্রতি তার আনুগত্য চিরকাল অটুট ছিল: সত্যগ্রহ, অহিংসা এবং চরকা।^৩

এই বিশ্বাসে তিনি এতখানি সবল ছিলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার পৈত্রিক বাড়ী ফরিদপুর হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানে না এসে ভারতে থেকে গিয়েছিলেন। এদিক দিয়ে অনেক সুবিধাবাদী মুসলমানের মতো পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী না হয়েও এখানে এসে অনেক কিছু গুছিয়ে নেওয়ার মানসিকতা তার ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি আবু মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ, শওকত ওসমান, আনিসুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, হাসান আজিজুল হক প্রমুখের তুলনায় অনেক বেশি সৎ ও প্রগতিশীল ছিলেন বলে ধরে নেওয়াই যায়।

কাজী আবদুল ওদুদের যে প্রবন্ধটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত-সমালোচিত হয়েছিল, তার নাম ‘সম্মোহিত মুসলমান’। এ প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—‘ইসলামের ইতিহাস বহু পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস।’ এরকম কথা বোধ হয় ইসলামের বড়ো শত্রুরা কিংবা অসূয়াপ্রবণ ওরিয়েন্টালিস্টরাও খুব বেশি লিখতে পারেননি।

সভ্যতার ইতিহাসে উত্থান-পতন থাকে, থাকে সফলতা-ব্যর্থতাও। ইসলামেরও আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম সভ্যতাকে কিছুই দেয়নি। এরকম অনৈতিহাসিক বাজে কথা ওদুদের মতো ভাবুকের কাছে প্রত্যাশিত নয়। এ ভুল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না অনিচ্ছাকৃত সেটা বলতে পারি না, তবে এসব কথা বলে মুসলিম সমাজের হিতৈষী দাবি করা একটু কঠিন কাজ বৈকি।

ওদুদ শরিয়তের বিরোধিতা করেছেন এবং এটির প্রত্যাবর্তনকে নাকচ করেছেন। অন্যদিকে রাসূলের প্রতি মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে তিনি পৌত্তলিকতার সাথে তুলনা করেছেন। রাসূলের নবুয়তকে খাটো করে মনুষ্যত্বকে বড়ো করে দেখিয়েছেন। ‘সম্মোহিত মুসলমান’ প্রবন্ধ ছাড়াও ‘মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ও বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা’ প্রবন্ধে তিনি একই রকম আওয়াজ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার সবচেয়ে বিখ্যাত কিতাব *শাস্ত্র বঙ্গ*-এ পাতার পর পাতাজুড়ে তিনি এসব কথার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন।

যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসব ধর্মীয় সংস্কারের কথা বিভিন্ন ধর্মেও শোনা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, ধর্মের তো একটা নিজস্ব মোরাল কোড থাকে, ওয়ার্ল্ড অর্ডার থাকে, রিভিলড প্রিন্সিপল থাকে—এগুলো বাদ দিলে ধর্ম থাকে না। যুগ যুগ ধরে ধর্ম যে টিকে থাকে এবং মানুষের অগ্রগতির সাথে চলমান থাকে, এর কারণ হচ্ছে ধর্মেরও একটা নিজস্ব অন্তর্গত ডায়নামিজম থাকে। এই

ডায়নামিজমের জোরে ধর্ম যুগোপযোগিতাকে আত্মস্থ করে এবং সদাসক্রিয় বিশ্বপ্রক্রিয়ার সাথে অংশগ্রহণ করে। ধর্মের এই ডায়নামিজম ওদুদ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তিনি বারবার মুসলমান সমাজের অচলায়তন, পরিবর্তনহীনতা ও পরিবর্তনবিমুখতার জন্য আফসোস করেছেন। সেকালের বাঙালি মুসলমানের অচলায়তন ও অস্বস্তির প্রধান কারণ ছিল বৈরী রাজনৈতিক-সামাজিক দুর্যোগ, যার কথা ওদুদের লেখায় দেখতে পাওয়া যায় না। মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়ার সামাজিক কার্যকারণ উদ্ধার না করে তিনি খামোখা এর জন্য ইসলামকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন।

যেকালে ওদুদ এসব কথা লিখেছেন, সে সময়েও মুসলমান সমাজে নব নব সংস্কার প্রচেষ্টা চলছে। একদিকে মুফতি আবদুহ, রশিদ রিদা, অন্যদিকে ইকবালের মতো যুগন্ধর ব্যক্তির মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন নতুন নীতি ও প্রস্তাব পেশ করেছেন। এগুলো কি ওদুদের চোখে পড়েনি?

মুসলমান সমাজের রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাকে ওদুদ রীতিমতো পৌত্তলিকতার সাথে তুলনা করেছেন। এটা ওদুদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় বৈকি। ইসলামের মতো তৌহিদবাদী বা একেশ্বরবাদী ধর্ম আর একটিও পৃথিবীতে নেই। তৌহিদ হচ্ছে এই ধর্মের সারাৎসার। এই ধর্মের অনুসারীরা তাদের নবিকে ভালোবাসে—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের নবিকে পূজা করে এরকম নজির ইতিহাসে নেই। আবার নবুয়ত ছাড়া রাসূলের প্রকৃত মর্যাদা কোথায়? এ যেন শাস ছাড়া ফলের খোসা নিয়ে টানাটানি। কোনো মুসলমান যদি ঘুণাঙ্করেও এরকম চিন্তা লালন করে, ইসলামে তার স্থান হবার সম্ভাবনা কম। এসব অনভিপ্রেত কথাবার্তা বলে ওদুদ ইসলাম ধর্মকেও কলুষিত করতে চেয়েছেন।

ওদুদ ধর্মের এক নতুন সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে ধার্মিকতার ওপর জোর দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিকতাকে তিনি ধর্মের চিহ্ন মানতে রাজি হননি। এও এক ওদুদের অদ্ভুত আবিষ্কার। এ যেন মেঘ ছাড়া বৃষ্টির প্রত্যাশা।

চার্চের সার্ভিস ছাড়া কি খ্রিষ্টধর্ম থাকবে? দূর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, দিওয়ালী ছাড়া কি হিন্দু ধর্ম সম্ভব? ওদুদরা বারবার যুক্তিশীলতা, কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলেছেন। কিন্তু ওদুদের এসব কথাবার্তায় যুক্তির ভার নেই বললেই চলে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও তার নেতা কর্মীরা এ দেশে প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইসলামকে মোকাবিলা করা শুরু করে। ইসলামের থিওলজিকাল বিষয়-আশয় নিয়েও প্রশ্ন শুরু করে। শিখাগোষ্ঠীর সাথে যারা যুক্ত ছিলেন, তারা কেউই শাস্ত্রবিদ বা আলেম ছিলেন না। ইসলামের থিওলজিকাল বিষয়ে তাদের যে খুব গভীর অধিকার ছিল, এমন বলা যাবে না। তারপরেও তারা থিওলজিকাল বিষয়ে অনধিকারচর্চাই করেছিলেন বলা চলে। আধুনিক কালে ইসলামের অকার্যকর হয়ে যাওয়া, ইসলামি শরিয়তের অংশত বর্জন, রাসূল (সা.)-এর নবুয়তকে গুরুত্বহীন মনে করা প্রভৃতির মতো বেপরোয়া কথাবার্তাও তারা বলেছিলেন।

ইসলাম ধর্ম ও ধার্মিকতাকে তাদের কাছে গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, অন্ধ বিশ্বাস, আড়ষ্ট বুদ্ধি, অতীতমুখিতা বলে মনে হয়েছিল। মনে হয় তাদের যত ক্ষোভ ছিল মোল্লা-মৌলভিদের ওপর। তাদের মনে হয়েছিল, এরাই ইসলামকে পিছু টেনে ধরেছে। তাই মধ্যযুগে ইউরোপের চার্চের মতো মোল্লাতন্ত্রকে তারা আক্রমণ করেছিলেন। মুশকিল হচ্ছে, চার্চের মতো ইসলামে মোল্লাতন্ত্রের কোনো জায়গা নেই এবং কখনো ছিল না। আলেমরা আমাদের সমাজে ইসলামি নৈতিকতার ঝাড়াটি ঐতিহাসিক কাল ধরে উঁচু করে ধরে আছেন। হয়তো এটাই ছিল তাদের বিরাগের কারণ।

বাঙালি মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ ছিল ঔপনিবেশিক জুলুম ও প্রতিকূলতা। আশ্চর্য হয়ে যাই, শিখাগোষ্ঠীর লেখকরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেননি; বরং কখনো কখনো ইংরেজদের প্রতি অনুরাগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে শিখাগোষ্ঠীর ইসলামকে নিয়ে অপ্রীতি প্রকট অন্ধতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই ‘যা কিছু হারায়, কেউ বেটাই চোর’-এর মতো ইসলামের দিকেই এরা নির্বিচারে তির নিষ্ক্ষেপ করে গেছেন। ওদুদের *বাংলার জাগরণ* গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির এই অন্ধতার দিকে ইঙ্গিত করে লিখেছেন—

‘সত্যের সন্ধানের মধ্যেও কিন্তু বারবার জাতীয় অভিমান, সামাজিক সংকীর্ণতা এবং অন্যান্য ধরনের মানবধর্ম বিরোধী মনোভাব এসে পড়ে। বাংলাদেশের জাগরণের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যারা বুদ্ধির মুক্তির দোহাই দিয়েছেন, তাঁরাও বহুক্ষেত্রে মনেপ্রাণে সংস্কারের দাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে—সংস্কার বিদেশজাত, কিন্তু স্বদেশিই হোক, আর বিদেশিই হোক, যেখানে বুদ্ধির সহজ প্রবাহকে আচার বা অভ্যাসে ব্যাহত করেছে, সেখানেই মানবধর্ম ঘা খেয়েছে। যারা বুদ্ধির মুক্তি ও মানব কল্যাণকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন, তাঁদেরও সময় সময় পদস্বলন হয়েছে।’^{১৬}

বলাই বাহুল্য, আমাদের সমাজে শিখাগোষ্ঠীর লেখকরাই প্রথম সাংস্কৃতিকভাবে ইসলাম নিয়ে সংশয়, সন্দেহ ও হীনম্মন্যতা তৈরি করে। হয়তো বলা যায়, কিছুটা নাস্তিকতাও প্রচার করে। আজকে

আমাদের মধ্যবিত্তের মধ্যে ইসলাম নিয়ে যে টানাপোড়েন দেখি, তার প্রথম বীজ রোপিত হয় এদের হাতেই।

শিখাগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা সমকালে কেউ গ্রহণ করেনি। কিন্তু এদের যুক্তি ভাষা পেয়ে যায় এ দেশে ভাষা আন্দোলনপরবর্তী ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকট উত্থানের ভেতর। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মডেলটা নেওয়া হয়েছিল কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু রেনেসাঁর শাঁস থেকে। শিখার মডেলও ছিল হিন্দু রেনেসাঁ।

ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে যে সেকুলার চিন্তার বিকাশ ঘটে, তার পেছনে শিখার যুক্তিগুলোই অনেকখানি কার্যকর ছিল। ১৯৬০-এর দশকে বদরুদ্দীন উমরের লেখা *বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন* এবং ১৯৮০-এর দশকে আহমদ ছফার লেখা *বাঙালি মুসলমানের মন-এ* যে যুক্তি সাজিয়ে বাঙালি মুসলমানকে শাপশাপান্ত করা হয়েছে, তার বহু কিছু শিখার চিন্তা থেকে আহরিত। বিশেষ করে এ দুটো লেখার পূর্বসূরি হিসেবে ওদুদের *সম্মোহিত মুসলমান*-এর কথা বলা যেতে পারে।

ভাষা আন্দোলনপরবর্তী বাঙালি জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে যে বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলা তৈরি হয়েছে, তা শিখারই বিলম্বিত স্বপ্ন পূরণ মাত্র। এই সিলসিলার মধ্যে আছেন আবদুল হক, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ। এদের চিন্তাচর্চার মধ্যে ইসলাম নেই। ইসলামকে কোনোভাবেই এরা আত্মপরিচয়ের অংশ হিসেবে মনে করেন না; ইসলামকে ভিত্তি করে রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতির বিকাশ তো দূরের কথা। আজকে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ভাষা ও ধর্মের ভেতরে লড়াই বাধিয়ে যে রক্তাক্ত বিভাজন তৈরি করা হয়েছে, তার আদি উৎস খুঁজতে হবে শিখার চিন্তাভাবনার মধ্যে।